# নীহারিকা

## আল-আমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ পত্রিকা

২০১৯-২০২০

একাদশ সংখ্যা

আল-আমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

যোগীবটতলা, বারুইপুর, কোলকাতা -১৪৫

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মোঃ রওশন আলি

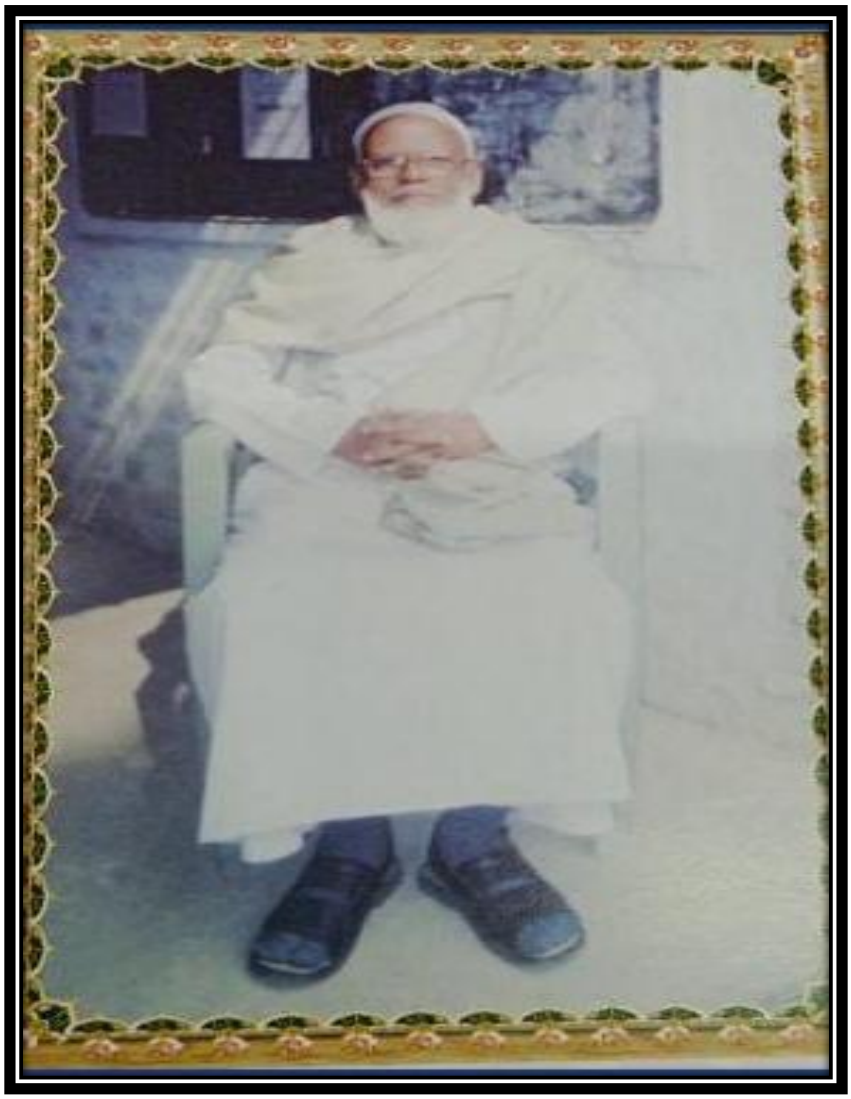

কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের একাংশ

# ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ

সেমিনার

# কলেজের পত্রিকা বিভাগ

সম্পাদক - অধ্যক্ষ ড. নুরুল হক

সহকারী সম্পাদক - অধ্যাপক : আজমিরা খাতুন
শায়েরা বেগম
মাতিন আহমেদ
সেখ আসগার আলি
আব্দুল আলি খান
দিলীপ কুমার হালদার
তাজউদ্দিন আহমেদ
আসাদুল্লা খান

# সম্পাদকের কলম

কলেজ পত্রিকা 'নীহারিকা'র পথ চলা শুরু ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে।তারপর প্রতি বছর পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। আমাদের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বরচিত মূল্যবান লেখনি দিয়ে উত্তরোত্তর কলেজ নীহারিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পত্রিকা কমিটি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। এ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ' নীহারিকা' তার একাদশতম সংখ্যার স্মারক।

আমি পত্রিকা কমিটি এবং যারা পত্রিকা কম্পোজিং, প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সহ সকলকে আন্তরিক ধণ্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, নীহারিকা আগামী দিনে তার প্রকাশ সফলগতিতে অব্যাহত রাখুক - এই প্রার্থনা করি।

ডঃ নুরুল হক
অধ্যক্ষ
আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

১১ ই জানুয়ারী, ২০২০
বারুইপুর

# সূচিপত্র

## কবিতা


To Late Al-hajj Prof. Roushan Ali. –
Prof. Matin Ahmed, (Department of English)

**মুহূর্ত- অধ্যাপক শায়েরা বেগম (বাংলা বিভাগ)**

স্মৃতির অ্যালবাম- বেনজীর খাতুন (শিক্ষা কর্মী)

**নূতন গান-** ফাতেমা খাতুন (প্রথম সেমিস্টার)

**আশা-সিমরান খাতুন ( শিক্ষাবিজ্ঞান )**

**অন্বেষণে- সগুপ্তা সরদার (বাংলা সাম্মানিক)**

**দারিদ্র্যের অভিশাপ-আফরিনা মণ্ডল(বাংলা সাম্মানিক)**

**মাতৃত্ব-সিরিন শবনম গাজী (ইংরেজি অনার্স)**

**অভিপ্রায়- সুজাউদ্দিন লস্কর (ইতিহাস অনার্স)**

**বন্ধুত্ব-রেক্সনা গাজী (ইতিহাস অনার্স)**

অন্তরের মলিনতা-আজরা খাতুন **(বাংলা অনার্স)**

**মা –মনিশা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)**

**নারী-জাসমিনা খাতুন (দর্শন অনার্স)**

রজনীগন্ধা-ফিরদৌসি খাতুন **(দর্শন অনার্স)**

**শীতের পশরা -তানজিলা খাতুন (দর্শন অনার্স)**

**সুখী-রজিনা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)**

**বাল্য বেলা- সেখ সামিম** (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

**ঋতুর স্বাদ – অধ্যাপক হোসনেআরা খাতুন**

মাতৃভূমি-**অধ্যাপক সবনম খান**

**পরিবেশ-সাবানা সুলতানা (বাংলা অনার্স)**

**kS.Prof -بيت المقدس/بيت القدس**

**ilA ragsA**


## বিশেষ রচনা


পবিত্র কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস- Prof. Sk Asgar Ali (আরবি বিভাগ)

**ক্ষমতায়নে নারী- তুহিনা খাতুন** (ইতিহাস অনার্স)


## প্রবন্ধ


**বাংলার লোকনৃত্য** -সাঞ্জিদা খাতুন (ইতিহাস অনার্স)


## বড় গল্প


অচেনা সকাল - **অধ্যাপক** আজমিরা খাতুন**(বাংলা বিভাগ)**


## কবিতা


**ঘুঘুর প্রার্থনা- অধ্যাপক ওসমান আলী লস্কর**

**মেঘ- নারগিস মোল্লা ((**ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

**صَبْرُ الْفُقَرَاءِ**-মকসুদুর রহমান (আরবি **অনার্স**))

**ঋতু পরিবর্তন –আকতার হোসেন** (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

রাঙা খুকু – উম্মে হাবিবা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

**তওবা** - সামরিন খাতুন **(বাংলা অনার্স)**

**ফুল-সওদা খাতুন** (আরবি **অনার্স**))

**ফুল ও ফল- সুরাইয়া খাতুন** (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

**আত্মকথা-** মুসকান খাতুন (ইতিহাস **অনার্স**))

**স্বাধীনতার মানে-নাসমিয়ারা খাতুন**(আরবি **অনার্স**))


## ভ্রমণ কাহিনি


**সাগর মেলা** –

**তানিয়া খাতুন** (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ -তানিয়া খাতুন (তৃতীয় সেমিস্টার)


## অনুগল্প


পবিত্র আলো - **অধ্যাপক** রাইসা রহমান **(বাংলা বিভাগ)**

শুভ যাত্রা –ফারহানা খাতুন **(বাংলা অনার্স)**


**যে কোনো মন্তব্য লেখকের ব্যক্তিগত**

# To Late Al-hajj Prof. Roushan Ali.

Prof. Matin Ahmed, (Department of English)

Beneath the solemn sky, where shadows fall,
A light extinguished, yet it brightens all.

Haji Prof. Roushan Ali, a name we hold,
In cherished memories, your story told.
He served a purpose, clear and true,
A home for knowledge, his vision grew.
From humble beginnings, a dream took flight,
Al-Ameen stands strong, in his guiding light.

A teacher's wisdom, a leader's care,
His kindness touched all, beyond compare.
For those unheard, he paved the way,
With patience and effort, day by day.

Though his time has passed, his deeds endure,
In hearts and lives, his legacy pure.

O Allah, grant him peace, eternal rest,
In gardens of Jannah, with the blessed.
His deeds, his love, are a witness true,
Reward him, O Allah, as only You do.

May his example inspire and guide,
As we walk the path he left behind.
Haji Prof. Roushan Ali's light will stay,
Through every prayer, in every way

# মুহূর্ত

**অধ্যাপক শায়েরা বেগম**

মুহূর্ত!
তুমি কত ভিন্ন-আশ্চর্য, নেই বোঝাপড়া;
তোমার হাত ধরে আমাদের ভাঙ্গা- গড়া।
সফলতা- বিফলতা, বিষাদে- আনন্দে
কত রূপে-রূপান্তরে, জীবনের ছন্দে।
কী অপরূপ রূপ তোমার, কাঠিন্যে পাষাণসম;
মন ভোলানো ভালোলাগায় তুমি অনুপম।
রূপ- রস- গন্ধ- বর্ণ, কী নেই তোমার,
রন্ধ্রে তুমি বয়ে চলো, স্বপ্নে বাঁচবার।
স্বাদে- বিস্বাদে ভরপুর; তুমি যেন রোদ্দুর
অনুভবে- অনুরোধে, বিচিত্রতায় সুদূর।
তুমি ক্ষুদ্রকণা, রূপের ছটায় জাগাও আশা
তাই মানবের ভালোবাসা,
জীবন সুমধুর।

# স্মৃতির অ্যালবাম

বেনজীর খাতুন

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি কি আসবে নারে ফিরে,
হাজার খুশি লুকিয়ে ছিল যে সব অন্ধকারে।
ভালোবাসার টুকরোগুলো পড়তো ঝরে ঝরে,
রঙীন তারা ফুটতো মোদের হৃদয় দ্বারে দ্বারে।
দুষ্টুমিতে সবার সেরা ছিলাম তো সব মোরা,
আমি রমা রহিম মোদের মত কেউ ছিল না জোড়া।
তা বলে কি পড়াশুনায় খারাপ মোরা ছিলাম,
মোটেই তা নয়, ইস্কুলেতে ছিল মোদের সুনাম।
ছুটির দিনে মা-মনিরা করতো না কেউ মানা,
আমরা সবাই খুঁজতে যেতাম শালিক পাখির ছানা।
বনে বনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত যখন দেহ,
পাখির ছানা না পেলে সব হতাশ হতো কেহ।
সকাল বিকাল সন্ধ্যাবেলা হারিয়ে যেতাম আমরা যারা।
হাতছানিতে ডাকতো মোদের নীল আকাশের শুকতারারা।
রঙধেনুর ঐ সাতটা বাহার জড়িয়ে দিতাম মনে,
ভেসে যেতাম আমরা সবাই সিন্ধু চাঁদের পানে।
আজকে আমার পড়ছে মনে সে সব দিনের কথা,
শীতের মত কাঁপছি আমি জড়িয়ে স্মৃতির কাঁথা।
বুকটা যেন শূন্য আমার করছে যে খাঁ খাঁ,
চোখের জলে ভাসছি আমি, ভাসছে সারা গাঁ।

# নূতন গান

ফাতেমা খাতুন (প্রথম সেমিস্টার)

নিশুতি রাতে নিশি ডাকে
গাঢ় নীলে আগুনের ফুলকি

হায়নাগুলো জঙ্গলে জঙ্গলে
রক্তচোষা পাখিগুলো ডাকছে বিকট সুরে
কুলিক রাত্রি কাল বেলা কাল রাত্রি
এলো তরুন ঊষা, নির্মল প্রভাত
মহেন্দ্রক্ষণ, অমৃত যোগ

নববার্তা আনলো তোরের সমীরণ
ফুলেরসৌরভে মাতোয়ারা দশদিক্
নীল সাগরের তরঙ্গভেঙ্গে
আসছে একদল শিশু
ভোরের পাখি গাইছে
নূতন দিনে নূতন সূরে নূতন গান।

# আশা

**সিমরান খাতুন ( শিক্ষাবিজ্ঞান)**

আজপৈশাচিক , অমানবিক সমাজে দাঁড়িয়ে
আমি ফিরে পেতে চাই মানবিক মুখ।
সোনার পাথর বাটির মতো যদিও
অসম্ভব।
লোভাতুর মন, স্বার্থের আঁচ
ভেঙেছে স্বাস্থ্য, ভেঙেছে সমাজ।
আজ বিষাক্ত এই প্রকৃতির কোলে
অধিকার বুঝি পড়েছে ঢলে।
নজরুলের সুকান্তের কথা
জাগিয়ে তুলুক জীবনের আশা।
সভ্যতা চির নবীন প্রাচুর্য নিয়ে
বুক ভরা বাচবারআশা নিয়ে ফিরুক ।

# অন্বেষণে

**সগুপ্তা সরদার (বাংলা সাম্মানিক)**

পুরানো সেই জীর্ণ স্মৃতি
সেখানে জড়িয়ে আছে আমার সমস্ত ভাঙ্গাগড়া-
প্রেমকে নৈরাশ্য করেনি  কখনই;
উদ্দীপিত করেছে মুগ্ধ করেছে।
অতীত হয়েছে কয়েকটা বছর।
জীর্ণ স্মৃতিকে আজ সোপান করেছি,
জীবনের আনন্দ আজ হয়েছে অতীত-
অন্বেষণ করেছি ফেলে আসা সুখের প্রতিটি মুহূর্তকে।
আনন্দময় মুহূর্তের গভীরতাকে খুঁজেছি
পাইনি কাছে।
যে প্রেমকে দিয়েছে অনাস্বাদিত আনন্দ
তাকে আজ খুঁজে পেতে চাই,
নিরবতায় নিস্তব্ধতায় নৈরাশ্যময় জীবনে-
কয়েকটা বছরের সেই জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি।

# দারিদ্র্যের অভিশাপ

**আফরিনা মণ্ডল(বাংলা সাম্মানিক)**

দারিদ্র্য!
মানুষকে ঠেলে দেয় দুঃসহ যন্ত্রণার দিকে-
গঞ্জনার লাঞ্ছনা নিঃশব্দে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।
তবুও মেঘাচ্ছন্ন অপরিণত ভাগ্যের আকাশে-
উদিত হয় নিষ্ঠুর সভ্যতার করাল অভিঘাত;
নিঃস্তব্ধ হয় নিরস্ত্র দরিদ্র জীবন। নিঃস্তব্ধতার চরম অভিশাপ;
নেমে আসে উদীয়মান আধুনিকতার পিঠে।
দাবি আজ জানিয়েছে মনুষ্যত্বের কাছে-
লোলুপতা সত্য,
তবু প্রেম বেঁচে আছে মানবের মাঝে।

# মাতৃত্ব

**সিরিন শবনম গাজী (ইংরেজি অনার্স)**

জন্মের প্রথম থেকে কোলে করে,
আমি মানুষ করেছি তোরে।
পাবো বলে মাতৃত্বের অধিকার।
শীত -গ্রীষ্ম তাপে রেখেছি তোরে ঢেকে
ছিলেম অপেক্ষায়, কখন উঠবি তুই মা বলে ডেকে।
নিজেমোমবাতির মতো পুড়ে দিয়েছি তোরে আলো
সেই আলোর প্রচ্ছায়া আমার জীবন দিয়েছে
অন্ধকারে ঢেকে।
আজ আমি বসে অবজ্ঞার অন্ধকারে
তুই যেথায় ঠেলে দিলি মোরে
তবুও তোকে আশীর্বাদ করি বারে বারে -
শুধুমাতৃত্বের অধিকারে।

# অভিপ্রায়

**সুজাউদ্দিন লস্কর (ইতিহাস অনার্স)**

বিলম্বিত বোধদয় বিফলিত নয়
বিকশিত হয় অনবদ্যতায়।
মানবিক মূল্যবোধ ভূ - লুণ্ঠিত হয়
সে এক স্বার্থ নিহিত বৈকল্পিক অভিপ্রায়।
সময়ের স্বার্থে মিলিত স্বহাস্যে
অকপট মোহময় আপন ঐতিহ্যে।
অদ্য বিভাজিত মানব হিতৈষণা
প্রভাসিত হয়ে ওঠে নিদারূন করুনা।
সামাজিকতার বন্ধন বিলুপ্তিত অভিপ্রায়
স্বাভাবিকতার মানদন্ডকে করেছে হীনময়।
প্রান্তিকতায় অবগাহিত নির্মল সত্ত্বা
ধরিত্রীর বক্ষে উদ্ভাসিত তারই নিদারুনতা।
তবে অন্যথায় বিভাজিত রয়
নিরূপিত হয় আত্মস্থতায়।
বিনম্র অভিপ্রায় বিকশিত করে
মানব মন ও মননশীলতার তরে।
বিকল্প আঙিনায় বিস্তৃত মন
রূপায়িত হয় তব সৃজন।
সৃজনী মনন করে অন্বেষন
সৃষ্টিশীলতার চির আহ্বান।
আগমনী বার্তা রয় বহমানতায়
অন্তর্নিহিত আন্তরিক আবশ্যিকতায়।

# বন্ধুত্ব

**রেক্সনা গাজী (ইতিহাস অনার্স)**

বন্ধুত্বের একটি চরম ধাপ জীবনের খাতায় প্রসিদ্ধ।
প্রতিটু মানুষ একে অপরের সথে বন্ধুত্বের জালে আবদ্ধ।

বিশ্বসংসার এই বন্ধুত্বের স্থান সর্বোচ্চ স্তরে উন্নিত।
একটি মানুষের ভালো মন্দ বন্ধুর সংখ্যায় অগণিত।

বন্ধুরা কখনও খারাপ হয় না, হয় না কখনও মন্দ।
স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে ধ্বংস করে ভালোবাসার ছন্দ।

বন্ধু যখন হারিয়ে ফেলে নিজের মানসিকতা।
সমাজের মাঝে কলুষিত, সে গড়ে তোলে বিশ্বাসহীনতা।

কিন্তু যে দিন আত্মম্ভরিতা চূর্ণ হয়ে ওঠে।
সেদিন সর্বহারা মানুষটিও বন্ধুর খোঁজে ছোটে।

বন্ধু সেও যার সাথে মেলে না নাড়ির স্পন্দন।
নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসলেই ঘটবে বন্ধুত্বের মেলবন্ধন।

বন্ধুত্বের দিনে তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করো।
তোমার সান্নিধ্যে এই দিনটা তাঁর কাছে হবে অনেক বড়ো।।

# অন্তরের মলিনতা

আজরা খাতুন **(বাংলা সাম্মানিক)**

মানবহৃদয়ের কোনো এক নিভৃত কোন থেকে
উঠে আসা গভীর দীর্ঘশ্বাস,
সভ্যতাকে করেছে আচ্ছন্ন।
গুমোট বাতাসের গোপনবার্তা
কুরে কুরে শেষ করতে চায়-
বিশ্বাস- মানবতা আর তোমার-আমার স্বপ্নালু বাস্তবতাকে।
সত্তা এখন নির্জীব- অপদার্থ - কাপুরুষ।
জান্তব লালসাকে চরিতার্থ করে পৈশাচিক উল্লাসে;
হে মহান, ছিন্ন করো মোহাবরণ।
ধর্মের ধ্বজা মেলে ধরো অন্তরে
সংস্কারের কলুষতা বর্জন করে
হয়ে ওঠো পবিত্র স্নিগ্ধ আর সুন্দর।

# মা

**মনিশা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)**

মা তুমি আমার এক চিরন্তন আস্থার জায়গা,
তুমি ছাড়া এই পৃথিবী দুস্তর মরু সম।
তোমার সীমাহীন ভালোবাসা,
আমার প্রতিটি আঘাত প্রশমিত করার ক্ষমতা তোমার।
তুমি নিঃস্বার্থভাবে আমার জন্য করেছ অনেক কিছু।
তুমি আমার শিক্ষক, আমার সান্তনা দাতা, উৎসাহ দাতা।
তাই প্রতিটি মুহূর্তে আমি তোমারই মত হতে চায়।
তুমি মোরে শিখিয়েছো পরকে আপন করার মন্ত্রনা।

# নারী

জাসমিনা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার (দর্শন অনার্স)

ধরিত্রীর প্রবাহমান ধারায়  নারী নিরূপিত।
বহুমুখী সৃজনশীলতার বহুমাত্রিক স্বরূপিত।।

যার ক্রোরেতে সৃষ্টি -প্রলয়ের লীলা খেলা চলে
সে যে  প্রকৃতি স্বরূপা নারী;
মাদারটেরিসা, নিবেদিতা ও মাতঙ্গিনী তারাও যে এক নারী।।

বিশ্বজুড়ে জয় জয়কার পরম মাতারাণী ;
যার গর্ভে জন্ম মোদের সেও তো এক নারী।।

বিশ্বসংসারে সে নারীরা আজও লাঞ্ছিত,  অবহেলিত।
অদ্যাপি তারা সমাজ গঠনে সদা প্রচেষ্টিত।।

পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বজগতে নরীরা যে সহযোদ্ধা ;
সমসম্মানের তারাও তো দবীদার
ভুলতে বসছো কি তোমরা!

প্রকৃতি যদি রুষ্ট হয়, প্রলয় যেমন আসন্ন।
স্নেহমতি নারী রুষ্ট  হলে বিশ্ব হবে জনশূন্য।।

# রজনীগন্ধা

ফিরদৌসী খাতুন
**পঞ্চম সেমিস্টার (দর্শন অনার্স)**

প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা ছোট্ট একটি গাছে
রজনীগন্ধা নামক পুষ্প ফুটেছে প্রকৃতির গড়া ছাঁচে।।

শ্বেতবর্ণ পাপড়ি যার নরম কান্ডে প্রস্ফুটিত
সাজানো রজনীগন্ধা গুলি ফুলদানিতে শোভিত।।

সম্পর্কের গভীর শুরু রজনীগন্ধার মালা দিয়ে।
বিদায় জানাই শায়িত দেহে এই ফুলমালাই দিয়ে।।

বন্ধনের ইঙ্গিতবাহী রজনীগন্ধা রাস্তায় আছে পড়ে।
ঝরে যায়নি তার পাপড়িখানি, মাঝরাত্রিরের ঝড়ে।।

দিনের আলো দেখার আশায় মগ্ন রজনীগন্ধার কুঁড়ি।
স্বভাবের বশে এর ওর বাগানের কেউ ফুল করেছে চুরি।।

রজনীগন্ধা কখনও চায় না কিছু নিজের জন্য করতে।
চাহে সে কেবল প্রীতির বন্ধনে অন্যের মন গড়তে।।

# শীতের পশরা

তানজিলা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার (দর্শন অনার্স)

শরতের শেষে হিমের পরশ এসেছে এই বঙ্গে।
উত্তুরে হাওয়ার মৃদুমন্দ বাতাস লাগছে মোদের অঙ্গে।।
সকালের আকাশ পুরোটাই যেন কুয়াশার চাদরে মোড়া।
দুপুরবেলার রোদের আমেজ আরামেতে ভরা।।

ঠান্ডারচোটে কুকুরেরাও ডাকে না তাদের ছন্দে।
প্রভাতকালে পাখিদের ঝাঁক লিপ্ত থাকে না দ্বন্দে।।

দিনের শেষে ঠান্ডার আমেজে শাল-চাদরে ভরা।
বনভোজনের উৎসবে মেতে ওঠা জনতার দেখা।।
পালং,মুল,শাক- সবজিতে ভরা শহরতলীর বাজার।
বিয়ের লগ্নে অনুষ্ঠান হলে সাজ  সজ্জার বাহার।।

মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ওদের করে না যে বিচলিত।
শীতের আমেজ উপভোগ থেকে  হয় না তারা বিরত।।

# সুখী

**রজিনা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)**

আমি পরম সুখী,
এই হিংসা,  দুঃখ, হানাহানির যুগে,
দুঃখকে, দুঃখ বলে  মনে নিই না আমি।
নিজেকে সান্তনা দেওয়া শিখে গিয়েছি তাই।
হে অন্তর্জমী তোমার প্রতি
আমার অগাধ বিশ্বাস তুমি আমারে গড়েছো এমনি।

# বাল্য বেলা

**সেখ সামিম (IHCA)**

শিশুকাল প্রিয়কাল
ছিল যতদিন,
সবাই করেছে আদর
মানবের অধীন ।
প্রভুর দানে বড় হলাম
ছিল সবই  দয়া ,
গুরুর আশিসে আমি
পেয়েছিগো ছায়া।
জেদছিল মোর খেলা নিয়ে ,
নিয়ম ছিল কড়া,
মনের জোরে জোর ছিল মোর
লিখব নতুন ছড়া।
কতদিন কতকাল
ভেবেছি আমি,
হয়নি  গো কোন ফল
অন্তর যামি।

# ঋতুর স্বাদ

**অধ্যাপক হোসনেআরা খাতুন**

গ্রীষ্মের মরসুমে মিঠে মিঠা ফল,
আম জাম আনারস নারকেলতাল।
সূর্যের কিরনেতে  ফুটি ফাটা মাঠ
তরুদের ডালে ডালে পাখিদের হাট ।
চাতকের অনুরোধে মেঘেদের সাড়া,
বর্ষার উৎসবে মেতে ওঠে পাড়া।
মেঘেদের ঘনঘটা আকাশের গায়,
ঝিল্লির কণ্ঠিতে পূর্ণতা পায়।
বর্ষণ নিল বিদায় শরৎ আগমন,
দুর্বল ধ্রমেরা পেল অবসান
ছুটি নিয়ে গুটি গুটি মেঘেদের দল,
গগনে গগনে তারা করে কোলাহল।
শরতের মেঘগুলি সবলের ছাই,
রবিমামার কিরণে কত শোভা পায়।
প্রকৃতির কণ্ঠেতে হেমন্তের গান ,
প্রভাতের শিশিরেতে শীত শীত টান।
ন্যাড়া নেড়া গাছগুলি হারিয়েছে প্রাণ ,
পল্লীর মাঠগুলি ভরে গেছে ধান ।
পুষ্পেরা ডালে ডালে সাজি সাজি রব ,
গোলাপ করবি  চাঁপা মালতিরা সব ।
বসন্তের আগমনে গুড বাই শীত ,
কুহু কুহু মধুমাখা কোকিলের গীত ।
মুকুলেতে ভরে গেছে আম জাম ডাল,
পিছিয়ে নেই আমি বলে গেল তাল।
মুকুলের গন্ধে তে ফিরে পায় প্রাণ ,
গুন গুনে ওলিরা সব গেয়ে যায় গান ।
ছয় ঋতুর পরিণয়ে বিদায় বেলায় ,
নববর্ষ উঁকি দেয় অধীর অপেক্ষায়।

# মাতৃভূমি

**অধ্যাপক সবনম খান**

মহান মোদের ভারতবর্ষ
ভারত মোদের দেশ।
দেশের কথায় গর্ব আমার
রইবে না ক্লেশ।
জগৎ জোড়া খ্যাত নামা
মোর দেশের জন্ম হতে,
এ দেশের মান রক্ষা হবে
জোয়ানদেরই প্রচেষ্টাতে।
আঘাত হানিছে যারা
মোর দেশের বুকে,
চালাও ছুরিকা তব
অসৎ এর দিকে।
দেশকে করিয়াছে খন্ডন
দুর্নাম জাতির দল,
তারাই জাতির জীবনকে
করিয়াছে কতল।
দেশকে বাঁচাতে যারা
দিয়েছে জীবন,
তারাই করিয়াছে যুগের
সরল আগমন।
জাতির হৃদয় জুড়ে
থাকিবে শহীদদের মান,
স্বর্নের ইতিহাস তা.

# পরিবেশ

**সাবানা সুলতানা (বাংলা সাম্মানিক)**

নীল আকাশের স্বপ্নগুলি দাঁড়িয়ে সারি সারি
ভাবছে তারা আপন মনে দেবে এবার পাড়ি।
যদি তাদের পাখির মতন থাকত দুটি ডানা
অনেক নূরে উড়ে যেতস করত না কেউ মানা।।

স্বপ্নের মতস আমিও ভাবি একা একা বসে
যদি আমি পাখি হতাম অনেক দূরে উধে যেতাম। ।
থাকতাম আমি সেখানে, যেখানে মনের মতো পরিবেশ পেতাম।
যেখানে নেই কোনও দ্বন্দ নেই হিংসা নেই কলহের পরিবেশ।

যেখানে আছে কেবল সুন্দর নির্মল একটা পরিবেশ।
কিন্তু হায়! কোথাও কি আছে  সেই নির্মল পরিবেশ?
তারই সন্ধানে ঘুরে ফিরি আমি আজ সারা দেশ
দেশ - দেশান্তরে তারই অন্বেষণে ঘুরতে যদি হয় তাও বেশ।
তবুও আমি দ্বন্দ্ব সংঘাত মুক্ত সুন্দর নির্মল একটা পরিবেশ।

# بي**ت المقدس/بيت القدس**

**Prof. Sk Asgar Ali**

بيت المقدس أو بيت القدس أو القدس الشريف واحدة من المدن الإسلامية المقدسة والقدس هي مسرى رسول الله محمد ﷺ بحسب المعتقدات الإسلامية .

**أهمية القدس في الإسلام:**

القدس هي ثالث أقدس الأماكن عند المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وكانت تمثّل قبلة الصلاة الإسلامية طيلة ما يُقارب من سنة، قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة في مكة. وقد أصبحت القدس مدينة ذات أهميّة دينية عند المسلمين بعد أن أسرى الملاك جبريل بالنبي محمد إليها، وفق الديانة الإسلامية، قرابة سنة 620 حيث عرج من الصخرة المقدسة إلى السموات العلى حيث قابل جميع الأنبياء والرسل الذين سبقوه وتلقّى من الله تعاليم الصلاة وكيفية أدائها. تنص سورة الإسراء أن محمدًا أُسري به من المسجد الحرام إلى "المسجد الأقصى": ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

**مكانة القدس في الإسلام:**

لقد خص القرآن المسجد الأقصى بالذكر ورفع منزلته حين جعله ربنا سبحانه وتعالى مسرى عبده وحبيبه سيدنا محمد، حيث قال يذكر القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسُمِّي بالمسجد الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.

**فضائل بيت المقدس وما حوله في القران:**

وصف القرآن في كثير من آياته بيت المقدس ومسجده بالبركة وهي النماء والزيادة في الخيرات والمنح والهبات؛ حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى: ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام في هجرته الأولى إلى بيت المقدس وبلاد الشام.

**فضائل بيت المقدس في الحديث:**

1- عن ميمونة مولاة النبي قالت: «قلت يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس»، قال: «أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه» [1]. 2- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم عرج بي إلى السماء» [2]. 3- عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال: "ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله ﷺ يذكر في الدجال، فذكر الحديث وفيه "علامته يمكث في الأرض أربعين صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى، عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فان الفضل فيه»

**مناقشة مهمة لبيت المقدس:**

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثاً: حكماً يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، وألاّ يأتي هذا المسجدَ أحدٌ لا يريد إلاّ الصلاة فيه إلاّ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله ﷺ : أما إثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة" ولأجل هذا الحديث كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي من الحجاز، فيدخل فيصلي فيه، ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء مبالغةً منه لتمحيص نية الصلاة دون غيرها، لتصيبه دعوة سليمان عليه السلام. روى الطبري في تاريخه عن قتادة قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة، وبعدما هاجر رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا

# পবিত্র কোরআন সংকলন
# ও
# সংরক্ষণের ইতিহাস

**Prof. Sk Asgar Ali**

আল কোরআন বিশ্বের বিস্ময়কর গ্রন্থ। এটি সর্বাধিক প্রশংসিত মহা প্রজ্ঞাময় রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নবী বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতারিত হয়েছে। বিশ্বজনীন এ গ্রন্থের আবেদন ও উপযোগিতা সব যুগে এবং সব স্থানেই কার্যকর রয়েছে। কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থ দুইবার নাজিল হয়েছে। প্রথমে একবার পুরো কোরআনের আয়াত প্রথম আসমানে 'বাইতুল ইজ্জতে' নাজিল হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে, যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে নাজিল হয়েছে। কুদরতি নিয়মে হাজারো বছর ধরে অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় এ গ্রন্থকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিখে রাখার পাশাপাশি হাজারো বছর ধরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে একে ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোরআনের লাখো হাফেজ বা মুখস্থকারী রয়েছেন।মানব ইতিহাসে আর কোনো গ্রন্থের এত হাফেজ নেই।রাসুল (সা.)-এর যুগে কোরআন

**সংরক্ষণ :**

যেহেতু পূর্ণ কোরআন একসঙ্গে নাজিল হয়নি; বরং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; তাই রাসুল (সা.)-এর যুগে শুরু থেকেই বই আকারে একে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। আসমানি গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে কলম-কাগজের চেয়েও একে অগণিতসংখ্যক হাফেজের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছেন। মুসলিম শরিফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.)-কে বলেছেন, 'আমি আপনার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করব, যাকে পানি ধুয়ে নিতে পারবে না।অর্থাৎ দুনিয়ার সাধারণ গ্রন্থগুলোর অবস্থা এই যে পার্থিব বিপর্যয়ের কারণে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়; কিন্তু কোরআনকে মানুষের অন্তরে অন্তরে এভাবে সংরক্ষণ করা হবে যে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকবে না। তাই প্রথম দিকে লেখার চেয়েও কোরআন মুখস্থ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশ হাফেজে কোরআন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন-হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, সাআদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজায়ফা বিন ইয়ামান, হজরত সালেম, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াবিয়া, ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন আস্ সায়েব, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা, উবাই ইবনে কাআব, মাআজ ইবনে জাবাল, আবু হুলাইমা মাআজ, জায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, মুজাম্মা বিন জারিয়া, মাসলামা বিন মুখাল্লিদ, আনাস ইবনে মালেক, উকবা বিন আমের, তামিম দারেমি, আবু মুসা আশআরি এবং হজরত আবু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ অন্যতম হাফেজ সাহাবি ছিলেন। (আল-ইত্বকান, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪) মূলত উল্লিখিত নামগুলো সেসব সাহাবির, যাঁদের নাম হাফেজে কোরআন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

অন্যথায় আরো অগণিত সাহাবির গোটা কোরআন মুখস্থ ছিল। কেননা বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) কখনো কখনো একেক গোত্রে সত্তরজন করে কোরআনের শিক্ষক পাঠাতেন। বিরে মউনার যুদ্ধে সত্তরজন কারি সাহাবি শহীদ হওয়ার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। হাফেজ সাহাবির সংখ্যা এতই বেশি যে ইমামার যুদ্ধে প্রায় সমসংখ্যক

হাফেজ, আরেক বর্ণনা মতে, পাঁচ শ (ইবনে কাছির, খ. ১, পৃ. ২৬), অন্য বর্ণনা মতে, সাত শ কারি/হাফেজ সাহাবি শহীদ হয়েছেন। (উলুমুল কোরআন, পৃ. ১৭৬)

**রাসুল (সা.)-এর যুগে কোরআন সংকলন :**

আরবদের দুনিয়াজুড়ে খ্যাত বিস্ময়কর স্মৃতির ওপর ভর করে কোরআন সংরক্ষণের পাশাপাশি রাসুল (সা.) লিখিতভাবে কোরআন সংকলন, সংরক্ষণ ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা করে গেছেন। ওহির ইলম লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি চল্লিশজন 'কাতেবে ওহি' বা ওহি লেখক নিযুক্ত করেছেন। সে সময় কাগজ ছাড়াও পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং চতুষ্পদ জন্তুর হাড্ডির ওপর কোরআন লিখে রাখা হতো। এভাবেই রাসুল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে কোরআনের একটি কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, যদিও তা পুস্তিকারূপে ও গ্রন্থিত আকারে ছিল না। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো কাছে ব্যক্তিগতভাবে কোরআনের সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ কপি বিদ্যমান ছিল। যেমনটা বুখারি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) কোরআন নিয়ে (অর্থাৎ কোরআনের কপি নিয়ে) শত্রুদের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারি শরিফ, খ. ১, পৃ. ৪১৯)

**আবু বকর (রা.)-এর যুগে কোরআন সংকলন :**

যেহেতু রাসুল (সা.)-এর যুগে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর কোরআন সংরক্ষিত ছিল, তাই হজরত আবু বকর (রা.) নিজ খেলাফতের সময় বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্র করে সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সহিহ বুখারি শরিফে। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ''ইমামার যুদ্ধের পরপরই হজরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখি ওমর (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন-ওমর (রা.) এসে আমাকে বলেছেন, 'ইমামার যুদ্ধে কোরআনে হাফেজদের একটি বড় অংশ শহীদ হয়ে গেছে। আর এভাবেই যদি বিভিন্ন স্থানে কোরআনের হাফেজরা শহীদ হতে থাকেন, তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, কোরআনের একটি বড় অংশ হারিয়ে যাবে। তাই আমার অভিমত হলো, আপনি চাইলে কোরআন সংকলনের নির্দেশ দিতে পারেন।' আমি তাঁকে বললাম, 'যে কাজ রাসুল (সা.) করেননি, সেই কাজ আমি কিভাবে করব?' জবাবে ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ কাজ উত্তমই উত্তম। এরপর ওমর (রা.) বারবার আমাকে একই কথা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর খুলে দিলেন। এখন ওমরের অভিমত যা, আমার অভিমতও তা-ই।' এরপর আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, 'তুমি বিচক্ষণ যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো খারাপ ধারণা নেই। রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তুমি ওহি লেখার কাজ করতে। তাই তুমিই কোরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো একত্র করো।' জায়েদ (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁরা যদি আমাকে সস্থান থেকে কোনো পাহাড় সরানোর আদেশ দিতেন, তাহলে তা আমার কাছে এত কঠিন মনে হতো না, যতটা কঠিন মনে হয়েছে কোরআন সংকলনের দায়িত্ব পালনের নির্দেশটি।' আমি বললাম, 'আপনারা এমন কাজ কিভাবে করবেন, যা রাসুল (সা.) করেননি?' আবু বকর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ কাজে মঙ্গলই মঙ্গল রয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বারবার তা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন, যে বিষয়ে বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন হজরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-কে। অতঃপর আমি কোরআনের আয়াত অনুসন্ধান করতে লাগলাম। সুতরাং কোরআনের আয়াতগুলো খেজুরের ডাল, পাথরের তখতি এবং মানুষের হৃদয় থেকে খুঁজে খুঁজে আমি তা একত্র করলাম। সুরা তওবার শেষ আয়াত আবু খুজাইমা আনসারি (রা.)-এর কাছে পেলাম, অন্যদের কাছে (লিখিতভাবে) তা আমি পাইনি'।" (বুখারি

শরিফ, হা. ৪৯৮৬; ইবনে কাছির : ভূমিকা) তবে নিঃসন্দেহে সে আয়াতটি হাফেজ সাহাবিদের মুখস্থ ছিল এবং সেটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা দ্বারাও কোরআনের আয়াত হওয়া প্রমাণিত। (উলুমুল কোরআন, তক্বি উসমানি, পৃ. ১৮৫)

**জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর গবেষণা পদ্ধতি :**

হজরত জায়েদ (রা.) নিজে কোরআনে হাফেজ হওয়া সত্ত্বেও এককভাবে কোরআন সংকলনের গুরুদায়িত্বটি আঞ্জাম দেননি, বরং তিনি চারটি পদ্ধতিতে কোরআন সংকলন করতেন। এক. কোনো আয়াত পাওয়া গেলে সর্বপ্রথম তা নিজের হিফজ ও মুখস্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। দুই. হজরত উমর (রা.)ও হাফেজ ছিলেন। বর্ণিত আছে যে তিনিও আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে জায়েদ (রা.)-কে সহযোগিতা করতেন। তিন. কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না যতক্ষণ না দুজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিতেন যে এ আয়াত রাসুল (সা.)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অথবা সেগুলো রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর আগে তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুরা তাওবার শেষ আয়াতটি যখন কেবল হজরত আবু খুজাইমা (রা)-এর কাছে পাওয়া গেছে তখন এ সূত্রে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে যে জীবদ্দশায় রাসুল (সা.) সে সাহাবির একজনের সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করে গেছেন। চার. অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে আয়াতগুলোর সমষ্টিকে বিভিন্ন সাহাবির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত কোরআনের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হতো।

**হজরত আবু বকর (রা.) সংকলিত কোরআনের বৈশিষ্ট্য :**

আবু বকর (রা.) সংকলিত কোরআনকে পরিভাষায় 'উম্ম' বা আদি কোরআন বলা হয়। কেননা এটিই প্রথম লিখিত সুবিন্যস্ত কোরআন। এর বৈশিষ্ট্য হলো-এটি রাসুল (সা.) বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। সুরাগুলো আলাদা রেখে দেওয়া হয়েছে; সুরার ক্রমধারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এটি সাত হরফ বা সাত কেরাতে লেখা হয়েছে। এ কপিটি হীরার হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। এখানে কেবল সেসব আয়াত লেখা হয়েছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়নি। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল একটি সুবিন্যস্ত, গ্রন্থিত কোরআনের কপি সংগ্রহ করা, যাতে প্রয়োজনের সময় এর দ্বারস্থ হওয়া যায়। এটি ১৩ হিজরিতে শুরু হয়ে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে প্রায় দুই বছরে সমাপ্ত হয়। (তারিখুল কোরআনিল কারিম, তাহের আল কুরদি; খ. ১, পৃ. ২৮)

হজরত আবু বকর (রা.) সংকলিত কোরআনটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। এরপর উমর (রা.)-এর কাছে। তাঁর শাহাদাতের পর নিজ অসিয়ত মোতাবেক রাসুল (সা.)-এর স্ত্রী, নিজ কন্যা হাফসা (রা.)-এর কাছে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর রাজত্বকালে এ কপিটি চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান এ কপি হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর কাছ থেকে নিয়ে যান। অতঃপর তিনি এ চিন্তা করে সেটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন যে উসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তুতকৃত কপির সঙ্গে এর কেরাতের পার্থক্যের কারণে অদূর ভবিষ্যতে ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কেননা উসমান (রা.) সাত কেরাতের পরিবর্তে এক কেরাত, আঞ্চলিক একাধিক ভাষার পরিবর্তে প্রমিত এক ভাষায় সে কোরআনটি সংকলন করেছেন। (উলুমুল কোরআন, তক্বি উসমানি, পৃ. ১৮৬-১৮৭) (চলবে)

# ক্ষমতায়নে নারী

**তুহিনা খাতুন** (ইতিহাস অনার্স)

নারী ক্ষমতায়ন শব্দটি নিজেই বোঝাই যে নারীরা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়-তাদের ক্ষমতায়েন করা দরকার ,।এই বেদনাদায়ক সত্য বহুকাল ধরেই বিদ্যমান। নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস সঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়নি।এটি ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত প্রক্রিয়া। যাইহোক কিছু আন্দোলন , প্রতিবাদ ও বিপ্লব রয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়নের কারণ কে আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।পুরুষশাসিত সমাজ সারাবিশ্বে নারী স্বাধীনতাকে দমন করেছে।মহিলাদের কোন বিষয়ে মতামত দেয়ার অনুমতি ছিল না। নারীরা শুধুমাত্র ঘরে বন্দি ছিল সময়ের সাথে সাথে তারা সকল বাধা অতিক্রম করে জীবনের আসল অর্থ অনুধাবনের সচেষ্ট হয়। ভোটাধিকার লাভের ফলে সমাজে নারীর অবস্থান উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত হয়েছে।

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে কোন নারী ক্ষমতায়িত হতে পারে না। সেই দিনগুলি চলে গেছে যখন নারীদের তাদের কাঙ্খিত জিনিস পেতে হলে পিতা বা স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। বিংশ শতাব্দীর পর থেকে নারীরা কর্মশক্তিতে যোগদানের আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে। নারীরা এখন নির্বিঘ্নে কর্মজীবন ও শিক্ষা উপভোগ করতে পারে।

সমাজের নিম্ন স্তরের নারীদের ক্ষমতায়ন না হলে নারীর ক্ষমতায়ন সফল হবে না। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বহুনিম্নস্তরের মহিলারা অনেক বৃত্তিমূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরেছে।

ভারতে নারীর ক্ষমতায়নকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ বৈদিক নারীরাও অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। নারী শিক্ষার প্রতি মনোযোগ কখনোই অনুপস্থিত ছিল না। এটা খুব স্পষ্ট যে প্রাচীনকালে ভারতে নারীরা সম্মান শিক্ষা ও শ্রদ্ধা উপভোগ করত। সময়ের সাথে সাথে ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষণশীল মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির দ্বারা দূষিত হয়েছে ফলে নারীরা যে ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করতে হারিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নারীরা তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতে শুরু করে। যদিও ভারতের অনেক মহিলা এখনো পুরুষতন্ত্রের খপর থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন বলে মনে করছেন। নারীদের দমনে গোড়া ধর্মীয় মতবাদ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়।

নারী ক্ষমতায়ন শব্দটি লিঙ্গ সমতাকে বোঝায় ,বিশেষ করে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে। যাতে নারী তার সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করবে ও একটি ইতিবাচক আত্মসম্মান ধারণ করতে পারবে। ভারত তথা বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের অবস্থান তৈরীর সম্ভাবনা অর্জন করবে। নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক হলেও ভারতের অর্থনীতিতে তাদের অবদান কম ,।তাই সমাজ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মহিলাদের সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক।

# বাংলার লোকনৃত্য

সাঞ্জিদা খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার (ইতিহাস অনার্স )

নৃত্য বা নৃত্যকলার ইংরেজি প্রতিশব্দ Dance এসেছে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ শব্দ Dancierথেকে, যা মূলত শারীরিক নড়াচড়ার প্রকাশভঙ্গীকে বোঝায়। নাচ বা নৃত্য হলো দৈহিক প্রতিভঙ্গিমা , তবে তা প্রতিদিনের ব্যবহার জীবনের প্রতিভঙ্গিমা নয়। এ প্রকাশভঙ্গী সামাজিক, ধর্মীয় বা মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এতে আছে গতি , মুদ্রা, সংযম ও ছন্দ।

নৃত্যকলা শিল্পের এমন একটি শাখা , যা খুব সম্ভবত প্রাচীনতম। প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হিসেবে নানা বস্তু পাওয়া গেলেও নৃত্যের তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন জনপদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নাচ প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরীয় দেয়ালচিত্রে ও ভারতীয় গুহাচিতে নৃত্যকলার বিভিন্ন ভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়। নৃত্যকলার ব্যবহার যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নাচের এই ব্যবহার ব্রাজিলীয় সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভারতীয় সংস্কৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। লোকসংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া এই নৃত্যকলাই হচ্ছে লোকনৃত্য। লোকনৃত্য নৃত্যকলার অন্তর্ভুক্ত হলেও কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তা শাস্ত্রীয় বা ক্লাসিক নৃত্য থেকে কিছুটা আলাদা। লোকনৃত্য ছন্দের কঠোর নীতি খুব একটা অনুসরণ করে না। ক্লাসিক নৃত্যের তুলনায় লোকনৃত্যে সংযম ও ছন্দের অভাব রয়েছে , কারণ এতে মুদ্রার ব্যবহার খুব একটা নেই। লোকনৃত্যের গতি, ছন্দ, অঙ্গকৌশল অনেকটা বাস্তব জীবনের কাছাকাছি।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে পোশাক ও সাজসজ্জা একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে পোশাক তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। লোকনৃত্য সাধারণত দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়। কারণ জীবনচক্রের গতিময় দলবদ্ধ আচরণই লোকনৃত্য বা পল্লীনৃত্যের অনুপ্রেরণা। লোকনৃত্যের বৈচিত্রেও বাংলা একইভাবে সমৃদ্ধ । ছৌ নাচ , ঝুমুর, ব্রিতা, টুসু, নাচনি, ইত্যাদি বাংলার বিখ্যাত লোকনৃত্য ।

**ছৌ নাচ:-** পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচের খ্যাতি বাংলা তো বটেই এমনকি দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে বিদেশেও । মুখোশ ও রং-বেরঙের পোষাক পরে ছৌ শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন । অন্য নাচের থেকে ছৌ-এর শিল্পকলা একেবারে আলাদা । এই নাচের ভঙ্গি মার্শাল আর্টকে মনে করিয়ে দেয়। ছৌ নাচের বেশ কিছু নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে । যেমন- দানব চাল (দানব বা রাক্ষসের নৃত্য) , দেব চাল (দেব-দেবীদের মতো নৃত্য) , পশু চাল (পশুর মতো নৃত্য), বাঘচাল (বাঘের মতো নৃত্য), ময়ূর চাল, হরিণচাল, ইত্যাদি ।

রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি জনপ্রিয় পৌরানিক কাহিনি ছৌ নাচের প্রধান বিষয়বস্তু । আদিবাসীদের শুভ অনুষ্ঠান , বিবাহ, বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা, বর্ষার আহ্বান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছৌ নাচ পরিবেশন করা হয় । সন্ধেবেলায় এই নাচের আসর বসে । রাত যত বাড়ে আসর তত জমে ওঠে । এই নাচের শিল্পীদের শিল্পসত্তার পাশাপাশি শারীরিক শক্তিও থাকা প্রয়োজন । সংস্কৃত ছায়া থেকে ছৌ কথাটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন । যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । ছৌ শিল্পের স্রষ্টা পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়া । তাঁর বাড়ি পুরুলিয়া বাঘমুন্ডার মুখোশ গ্রাম নামে পরিচিত চড়িদা গ্রামে ।

থাকে । পুরুষদের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন । তাঁর হাতে একটি বড় তাল পাতার হাতপাখা থাকে । তিনি সেটি দিয়ে পাকা ফসলে হাওয়া দিতে থাকেন । ফসল পাকার আনন্দে সকলে নৃত্য করেন । এই নাচ সাধারণত মঞ্চে বা কোনও অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয় ।

**কাঠি নাচ:-** কাঠি নাচ প্রকৃতপক্ষে রণপা নাচ । রণপার ওপর দাঁড়িয়ে পুরুষশিল্পীরা এই নাচ পরিবেশন করেন । এই নাচ যথেষ্ট বিপজ্জনক । এর জন্য দীর্ঘদিনের অনুশীলন প্রয়োজন ।

**বাংলার লোকনাট্য:-** যাত্রাপালা, পুতুল নাটিকা, পালাগান ইত্যাদি বাংলার লোকনাট্যের অন্তর্গত ।

**যাত্রা:-**বাংলা লোকনাট্যের প্রধান হল যাত্রা । সংলাপ , নাচ, গান, অভিনয় সবকিছুর সংমিশ্রণ হল যাত্রা । পূর্বে পৌরাণিক কাহিনি, আধ্যাত্মিক কাহিনির মাধ্যমে জনজাগরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাত্রার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য । আনুমানিক ষষ্ঠদশ শতকে ভক্তি আন্দোলনের সময় উৎপত্তি হয় যাত্রার । প্রথম প্রথম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা নিয়ে যাত্রা রচিত হত । জয় দেবের গীতগোবিন্দ , চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যাত্রার সৃষ্টি । পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত সহ পুরাণ, মহাকাব্য, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুও যাত্রার অন্তর্ভুক্ত হয়েছ । তারও পরে যাত্রার সামাজিক বিষয়, রাজনীতি ইত্যাদির প্রবেশও ঘটেছে ।

**পুতুলনাটিকা বা পুতুল নাচ**

বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল পুতুল নাটিকা বা পুতুল নাচ । সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি পুতুলগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে সুতো বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাঁধা হয় । রঙিন কাপড় ও সাজপোশাক পরিয়ে পুতুলগুলিকে সাজানো হয় । পুতুলের পা থাকে না, পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চির কাঠামো থাকে । পর্দার বাইরে থেকে শিল্পীরা পুতুলে বাঁধা দড়ি বা কঞ্চি টেনে নানা পদ্ধতিতে সেগুলিকে নাড়ান । বাচিক শিল্পীদের সংলাপ ও গান এবং তার সঙ্গে পুতুল শিল্পীদের কারুকার্যে নাটক জমে ওঠে । মূলত ধর্মীয় , ঐতিহাসিক, সামাজিক গল্প নিয়েই পুতুল নাটক লেখা হত । বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পটভূমিরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে ।

**পালাগান :-**পালাগান অনেকটা গীতি নাট্যের মতো । কোনও ঘটনা বা গল্পকে সুর দিয়ে গানের আকারে প্রকাশ করাই হল পালাগান । ধর্মীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পালাগান লেখা হত ।

**বিষহরা পালা:-** জলপাইগুড়ি জেলার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান এই বিষহরা পালা । মূলত মনসা মঙ্গল কাব্যকে নাটকের আকারে মঞ্চস্থ করা হয় । চাঁদ সদাগর , বেহুলা-লখিন্দর, দেবী মনসা , প্রভৃতি চরিত্রগুলি বিষহরা পালার মূল আকর্ষণ ।

**আলকাপ:-** নাচ, গান, নাটকের সংমিশ্রণ আলকাপ মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম এবং বাংলাদেশের রাজশাহীতে বেশ জনপ্রিয় । বিহারের দুমকা ও পূর্ণিয়া এবং ঝাড়খণ্ডেও এই আলকাপের প্রচলন রয়েছে । আল কথার অর্থ কাব্যাংশ । আর কাপ কথাটি এসেছে কাব্য থেকে । ১০-১২ জনের একটি দল আলকাপ পরিবেশন করে । দলের প্রধানকে বলা হয় সরকার বা গুরু । আলকাপ ৫টি পর্বে পরিবেশিত হয় । এগুলি হল আসর বন্দনা , ছড়া, কাপ, বৈঠকি গান ও খ্যামটা পালা । গ্রাম্য সামাজিক বিষয় আলকাপের মূল প্রেক্ষপট ।

**ডোমনি:-** মালদা জেলার জনপ্রিয় লোকনাট্য ডোমনি । নিতান্তই পাড়া গেঁয়ে নাটক । গরিব মানুষের দৈনন্দিন বিষয় এই লোকনাট্যের মূল বিষয়বস্তু ।

মানব সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় এই সকল লোকনৃত্য ,যার মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয় বঙ্গীয় জীবনধারার, প্রতিফলিত হয় সার্বিক জীবনশৈলী

# অচেনা সকাল

অধ্যাপিকা আজমিরা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

সকালের রাস্তা আর বেলার রাস্তার মধ্যে বিস্তর ফারাক।শুধু রাস্তাইবা বলছি কেন! পুরো পরিবেশের কথাও বলা যায়।সকালের রাস্তায় একটা আলাদা রকমের শান্তি আছে।আজ অনেকদিন পরে মিনু সকাল সকাল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। অনেকদিন ধরে ভাবছিল কিন্তু হয়ে ওঠে না।আজ শরীর বিছানা চাইলেও মনকে বুঝিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে।গতকাল বাড়ির সবাইকে বলে রেখেছিল সকাল সকাল ডেকে দিতে। মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়েও রেখেছিল। পাছে হাতের কাছে থাকলে ঘুমের মধ্যে বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ে, তাই দূরে সানসেটের উপর তুলে রেখেছিল ফোনটা। যাতে অ্যালার্ম বন্ধ করতে গেলে বিছানা ছাড়তে হয়।তাই হয়েও ছিল। চারিদিকে কারখানার গান বাজনা তাদের গ্রামের দিবারাত্রির পরিবেশকে বিশাক্ত করে তুলেছে । এমনকি সেখানকার অল্প বয়সী গাঁজা খোর কর্মচারিদের চিৎকার মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া তার নিজেরও কিছু কিছু কাজ থাকে। সব কিছু সামলে ঘুমাতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ঘুম আসতেও দেরি হয়। রাতে বিশেষ ঘুম হয় না।ঘুম আসে ভোরের দিকে। মিনু সেই মতো তার রুটিনও তৈরি করেছিল কিন্তু  ইদানিং শরীর তার রুটিন মানতে চায় না। ডাক্তার পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন ‘বাঁচতে চাইলে সকালে একঘন্টা হাঁটুন। ব্যয়াম করুন।‘তাই বেরিয়ে পড়া। আগের বারে শরীর যখন খুব খারাপ ছিল তখন সে প্রতিদিন বের হত। মাঝে কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার শুরু করেছে। না হলে উপায় নেই।

বাড়ি থেকে বের হলেই বড় রাস্তা। তার দুদিকে অসংখ্য দোকান। বলতে গেলে ছোটো খাটো একটা বাজার। রেস্টুরেন্ট, মুদির দোকান থেকে শুরু করে চা, পান, বিড়ি, জুতো, জামা-কাপড়ের দোকান, আইসক্রিম, সব্জি, মাছ মাংস,ওষুধের দোকান,, হাড়ি-খোলা, জেরক্স, মিষ্টির দোকান , ইলেক্ট্রনিক্স, হোটেল, ফার্নিচার, স্টেশনারি দোকান,পার্লার, টেলার্স, মোবাইলসপ, গ্যারেজ, ডাক্তারখান, কামার দোকান, সেলুন, পার্টি আফিস সবকিছুর দেখা মেলে।দোকান গুলোর পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দর্জি, ব্যগ আর গ্লাভসের কিছু কারখানা।একটু বেলা হলেই ছাদে বক্স লাগিয়ে শুরু হয় তাদের রংবাজি। তা চলে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কখনও তার আগে শেষ হয় কখনও বা পরে।কেউ কিছু বলতে গেলেই শুরু হয় হাতাহাতি লাঠালাঠি। তাই কেউ কিছু বলতেও যায় না।মিনু একবার বিরক্ত হয়ে গ্রামের মোড়লদের জানিয়েছিল।

অথচ সকালবেলা বের হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটার এত বদলে যায়। যাগকে আজ সকালটা মিনুর বেশ ভাল লাগছে। রাস্তায় লোকজন কম। গাড়িও কম চলছে কয়েকটা টোটো, বেশির ভাগই সাইকেল। মাঝে মাঝে ঘিষ ঘিষ করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দু-একটা বাইক।দুজন স্বামী-স্ত্রী দৌড়চ্ছে ট্রেন ধরার জন্য। তারা শহরে বাবুর বাড়ি কাজ করে। এখান থেকে স্টেশনের দুরত্ব তিন কিলো মিটার। রোজ তারা এই পথটা হেঁটেই যায়। তাতে হয়ত কিছু গাড়ি ভাড়া বাঁচে।কয়েকজন দৌড়চ্ছে শরীরে মেদ কমানোর জন্য। আবার কয়েকজন বাধক্যজনিত জড়তা কাটানোর জন্য। বেশ কয়েকজন আছে এন-সি-সি ট্রেনিং এর জন্য। আবার কেউ রাস্তায় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে।গ্রামের কৃষকরা একে একে তাদের বাগানের চাষের সব্জি ঝুড়িতে ভরে রাস্তায় এসে বসছে।তাদের ঝুড়িতে আছে টাটকা কলমি শাক, কুলপি শাক, পুঁই শাক, ও পালং, শাক। তাছাড়া কলা, মোচা,থোড়, ঝিঙে, ধোঁধলও আছে। কেউ ঘুনি হাতে কাদা পায়ে মাঠ থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুনিতে

আছে ছোট ছোট চিংড়ি মাছ। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা মানুষে নানা জিনিসে ভরে যাবে মোড়টায়। সকালে চায়ের দোকানে বসে থাকা মানুষ গুলো একে একে সরে যাবে। সেখানে ভিড় করবে নতুন মুখ। নতুন জিনিস।

এইসব ভাবতে ভাবতে মিনু এগিয়ে যায়। হঠাৎই সাইকেলে চেপে পাশ দিয়ে যাওয়া মধ্যবয়সী লোকটা বলে ওঠে "কিরে মা ভাল আছিস? সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিস?"

মিনু উত্তর দেয় "হ্যাঁ কাকা ভাল আছি। আপনি?"

কথা শেষ হতে না হতেই লোকটি পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মিনু দেখতে পায় তার সাইকেলের ঝুড়িতে কয়েকটা বিস্কুটের প্যাকেট।একটা কৌটোও আছে। তাতেও বিস্কুটে ভরা। রাস্তার পাশে একটা কুকুর কে বসে থাকতে দেখে নিচু হয়ে কয়েকটা বিস্কুট ঝুড়ির প্যাকেট থেকে বের করে "আয়" বলে রাস্তায় ছুড়ে দেয়।কুকুটি প্রথমে দাঁড়িয়ে গাটা ভাল করে ঝেড়ে নেয়। চলন্ত সাইকেলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে তারপর খুশি মুখে কুচি করা বিস্কুট গুলো খেতে শুরু করে। দূরে আরও কয়েকটা কুকুর চায়ের দোকানের পাশে বসে লেজ নাড়াচ্ছে। তাদের কোনো হেল দোল নেই। হয়ত নিজেদের সুপিরিয়র ভাবছে। তাই খাবার দেখেও তেড়ে আসছে না।

রাস্তার পাশের ছাদের ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঘুম জড়ানো চোখে একটা বউ বলে উঠল "ও দিদি হাঁটতে যাচ্ছো বুঝি?"

মিনু হেসে উত্তর দেয় "হ্যাঁ গো। তুমি যাবে ?"

সে কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে নেয়।মিনু ভাবতে থাকে এই মানুষ গুলোকে সে চেনে। কিন্তু জানে না। কখনও কথাই হয়নি।হয়তো প্রয়োজন হয়নি বলে।কিন্তু আজ এই সকাল সব প্রয়োজনের বাইরে।যারা অন্য সময় পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তারাই সকালে দেখা হলে হেসে কুশল বিনিময় করে। সেধে কথা বলতে চায়। যাদের সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা যায় না বলে সে ভাবত, আজ দেখছে তাদের সঙ্গে দিব্যি প্রয়োজনের বাইরে অনায়াসে কথা বলা যায়। যারা তাকে চেনে না তারা চেনার চেষ্টা করছে, যারা জানে না তারা জানতে চাইছে। পরিচিত হতে চাইছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে দেখে রাস্তার পুলের পাশে বট গাছের নীচে দুটো কুকুর চুপচাপ একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আর রাস্তার মাঝখানে একটা কুকুর ব্যস্ত চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছে। কয়েকটা শালিক রাস্তার উপরে ডানা ঝাপটে কিচিরমিচির করতে করতে মিনুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।হঠাৎ মিনুর মনে হল কুকুরটি প্রেমিক যুগোলকে যেন পাহারা দিচ্ছে। যেমন এখনকার স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা প্রেম করলে দুরে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা পাহারা দেয় তেমনই।মিনু কুকুর গুলোকে দেখে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কয়েক পা এগিয়ে যেতে দেখল কিছুটা দূরে একটা বাড়ির সামনে চার পাঁচটা কুকুর একটু দূরে দূরে চুপচাপ বসে আছে, কেউ মুখ গম্ভীর করে আছে, কেউ মুখ নিচু করে, কেউ চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে। মিনু লক্ষ্য করল এখানকার সকালের রাস্তায় মানুষের থেকে কুকুরই বেশি।তারা যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মত সময় কাটাচ্ছে। দেখলে মনে হয় গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন।কাউকে তেড়ে যায় না। অচেনা মানুষ দেখলে চিৎকারও করে না।

মিনুর মনে পড়ে তার ছোটো বেলার কথা।তখন তাদের বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের আলো এসে পৌঁছয়নি।গ্রামের কয়েকটা বাড়ি ছাড়া প্রায় কারও বাড়িতে ইলেক্ট্রিক আসেনি। লণ্ঠন বা হ্যারিকেনের আলোতেই সব। সন্ধ্যা হলে মিনু লণ্ঠন হাতে দিদির সঙ্গে পড়তে যেত। বাড়ি থেকে একটু দূরে গবিন্দ মণ্ডলের বাড়িতে। পিচ রাস্তা থেকে নেমে লম্বা একটা মাটির রাস্তা। এক পাশে শবেদা বাগান আর অন্য দিকে ধান ক্ষেত। তা পেরিয়ে হোগলা গাছের জঙ্গল ঘেরা ভাঙ্গা মাটির দালানে ছেঁড়া কাদাওলা চটে গিয়ি বসতে হত তাদের।কাদা পায়ে দালানে ওঠার জন্য গবিন্দ মণ্ডলেরমা

আর স্ত্রী অর্ধেকদিন গালি গালাজও করত। মাঝে মাঝে মাস্টার মশাইয়ের জন্য রাখা তোলা জলে তারাও পা ধুয়ে ফেলত। তার জন্য কথাও শুনতে হত তাদের। শুধু তাই নয় নিজের ছেলে মেয়ের পড়ার জন্য কোনো লণ্ঠনও দিত না তারা।উলটে গবিন্দ মণ্ডলেরস্ত্রী মিনুদের লণ্ঠনটা মাস্টার সামনে বসিয়ে দিয়ে তার ছেলে মেয়েকে মাস্টারের দু পাশে বসিয়ে দিয়ে যেত। বাকি সবাই আধো আলো অন্ধকারে বসে থাকত।মাস্টারও তাদেরকেই ভাল করে পড়া বুঝিয়ে দিত। পড়া শেষ করে তারা যখন রাত্রি নটা দশটার সময় বাড়ি ফিরত তখন সাইকেলের রিংএর তারে লাগানো প্লাস্টিকের ফুলের ওঠাপড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো কিছুর আওয়াজ পাওয়া যেত না। শুধু ছিল চারিদিকে নিস্তব্ধতা।আর থেকে থেকে হোগলার জঙ্গল থেকে ভেসে আসত শিয়ালের ডাক।আবার কখনও কখনও শবেদা গাছের ডালে বসে ডাকত প্যাঁচা। সঙ্গে ধান ক্ষেত থেকে নিরন্তন ভেসে আসত ঝিল্লীর ডাক আর সোঁদা মাটির গন্ধ।কাছে গেলেই সেই ডাক বন্ধ হয়ে যেত। আবার হাঁটতে শুরু করলে ফেলে আসা পথে তারা রেষারেষি করে ডাকতে শুরু করে দিত।যেনো লুকোচুরি খেলা।মিনু কতবার যে পা টিপে টিপে ওই রাস্তা পার হয়েছে তার ঠিক নেই।, কখনও চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে পড়েছে তাদের ডাক কাছ থেকে শুনবে বলে। আর তখন ধান ক্ষেতের উপরে মনের আনন্দে ভেসে বেড়াতে দেখছে অসংখ্য জোনাকিকে।তাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে গিয়ে মিনু বহুবার দল ছাড়া হয়েছে। মিনুর মা জানতে পেরে তার দিদিকে একদিন সতর্ক করে বলেছিল "খবর দার ওই রাস্তায় ওকে একা ছাড়িসনে। ওখানে ভূত আছে।'কিন্তু  কোন ভুত যে মিনুর মাথায় চেপে বসেছিল তার খবর তার মা বা দিদি কেউ কখনও জানতে পারেনি।

তখন রাস্তার মোড়ের কুকুর গুলোর ছিল সতর্ক দৃষ্টি। মোড়ের মাথায় পা দিলে অন্ধকার ভেদ করে জ্বল জ্বল করা দুটো চোখ নিয়ে কুকুর গুলো এগিয়ে আসত তাদের দিকে। আকাশ ভেদ করা চিৎকার জুড়ে দিত। এক ঝড় বৃষ্টির রাতে তাদের লণ্ঠন দমকা হাওয়ায় নিভে গেলে। অন্ধকারের মধ্যে একটা কুকুর হুড়মুড়িয়ে এসে মিনুর দিদির গায়ে গিয়ে পড়ে।তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। একবার তো পাড়ার নতুন জামাইকে কুকুরে তাড়া করে 'শ্রীকান্তের নতুন দা'র মতো খালে নামিয়ে দিয়েছিল।কথাটা মনে পড়ায় মিনুর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে। মিনু লক্ষ্য করে এখন গ্রামে আর সেই নিস্তব্ধতা নেই, সেই কুকুরের উৎপাতও নেই।এখন কুকুরেরা আর অচেনা মানুষকে তাড়া করে না।মাঝরাতে গ্রামের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় না।চিৎকার করে মানুষের ঘুম ভাঙ্গায় না।এখন ওরা আর রাত জাগে না।এখন রাত জাগে অন্য কেউ।অন্য কারও উল্লাসে মানুষের চোখের ঘুম ওড়ে।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজে মিনু চমকে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে কখন সে কুকুর গুলোর কাছে চলে এসেছে বুঝতেই পারেনি। শুনতে পায় রাস্তার পাশে প্লাস্টিকে মোড়া ঘর থেকে ভেসে আসছে সদ্য পুত্রহারা মায়ের যন্ত্রনাদগ্ধ কণ্ঠস্বর। আর বাইরে তাকে পাহারা দিচ্ছে কুকুর গুলো। দুটো ঘুঘু তাদের ঘরের চালে বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে।সূর্য তখন পূর্ব দিকে একটু একটু করে লাল হতে শুরু করেছে।

# ঘুঘুর প্রার্থনা

**অধ্যাপক ওসমান আলী লস্কর**

শিকারি মৃগয়ায় যায় লয়ে ধনু তীর,
চারিদিকে চেয়ে রয় চক্ষু নাহি স্থির।
সামনে বটগাছ দেখিবারে পায়,
দেখি গিয়ে ডালে বসে ঘুঘু একতায়।
অমনি তাহার দিকে করিল নিশান,
ছাড়ি তীর মারি ঘুঘু এই তার ধ্যান।
উড়িয়া পালাতে চায় দেখে তাকাইয়া,
উপরেতে বাজপাখি নিশান করিয়া।
উপায় না দেখি প্রভু করি নিবেদন
উদ্ধার করো হে প্রভু নিকটে মরণ।
বিষধর সাপ এক কত কাল ধরে,
আশ্রয়ে লইয়া ছিল বট বৃক্ষ জুড়ে।
হেনসময় শিকারি করিল মোর নিশান,
ছাড়ি তীর মারি ঘুঘু এই শুধু ধ্যান।
হেন সময়ে সর্প এসে নিস মারে পায়,
অমনী সঞ্চারিল বিষ তার সারা গায়।
থর থর কেঁপে তার হাত টলে গেল,
ছাড়া মাত্র তীর সেই বাজকে লাগিল।
নিচেতে শিকারি মরে উপরেতে বাজ,
মধ্যস্থলে ঘুঘু বাঁচে এই কার কাজ।

# মেঘ

**নারগিস মোল্লা (IHCA)**

সাগরেতে জন্ম আমার আকাশেতে বাস
বায়ুর পিঠে ভেসে ভেসে বেড়াই  বারোমাস।
দুঃখে আমি ঝরে পরি বৃষ্টি আকারে,
সেই বৃষ্টির তৃপ্তি মেটায় বিশ্ব মাঝারে।
আনন্দ দিয়ে হাসি ফোটাই জীব কূল কে,
সেই আনন্দে মেতে ওঠে বিশ্ববাসী যে।

আমি মেঘ হয়েছি আমি মেঘ হয়েছি,
আমি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াই বায়ুর পিঠেতে।
যেখানে খুশি সেখানে বেড়ায় বিশ্ব মাঝারে,
আমার ঝরায় মাঝে মাঝে মানুষ আনন্দে যে পায়।
আবার আমার ঝরায় কখনো বা দুঃখ যে সব পায়,
তখন আনন্দে সব মাঠে তখন বৃষ্টি আকারে আসি
যখন আনন্দে সব মাতে তখন।
বন্যা রূপে দেখা দিলে ভয়ঙ্করী হই তখন,
সুখের দিনেও সঙ্গী আমি দুঃখের দিনেও ভাই।
সাগরেতে জন্ম আবার সবার ঊর্ধ্বে বাস,
বায়ুর পিঠে চড়ে আমি বেড়াই বারো মাস।

# صَبْرُ الفُقَرَاءِ

-মকসুদুর রহমান (আরবি **অনার্স**))

خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَرَكُوا أَمْوَالَهُم وَدِيارَهُمْ، وهَاجَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَكَانَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ضَعِيفاً لا يَقْدِرُ على الْعَمَلِ، وليس لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا، وَلَا مَأْوَى يَأْوِي إليه، فَكَانُوا يَنَامُونَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَتَحَمَّلُونَ الْجُوعِ، وَيَصْبِرُونَ على ذَلِكَ، وَيَجْتَهِدُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءِ وَأَلا يَبْتَعِدَ عَنْهُمْ

وفِي أَحَدِ الأَيَّامِ، دَخَلَ الرَّسُولُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ الْفُقَرَاءِ جَالِسِينَ: وَأَحَدُهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ، عليهِمُ الرَّسُولُ : فَلَمَّا قَدِمَ . سَكَتَ الْقَارِئُ، فَسَأَلَهُمْ : مَا ا كُنتُمْ تَصْنَعُون؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ! كَانَ قَارِئُ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا، وَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلى كِتَابِ اللَّهِ.

فَقَالَ : «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ». ثُمَّ جَلَسَ بَيْنَهُمْ وأَشَارَ إليهِمْ لِيَلْتَفُوا حَولَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا يا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ ( فُقَرَاء) الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامُ يَومَ الْقِيَامَةِ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنصف يوم، وَذَاكَ خَمْسُمِئَةِ سَنَةٍ.

# ঋতু পরিবর্তন

**আকতার হোসেন (IHCA)**

Change, change, change,
শুধুই পরিবর্তন,
দেখো না তাকিয়ে প্রকৃতির দিকে,
গ্রীষ্মে হয় না প্রখর রৌদ্র।
হচ্ছে কেবল শুধুই গুমসো,
হয়তো সূর্য্যি মামা মুখ ভার করে লুকিয়ে আছে কালো মেঘের আড়ালে।
বর্ষায় হয়না ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি,
আকাশ বলছে দেখ মানব কুল।
তোদের অকর্মে আমি করেছি কি সৃষ্টি!
বর্ষার আকাশে নাহিক মেঘ,
আছে শুধু গা ঝাঁঝালো রোদ।
শরৎ বলতে দেখা যায় না কোন চিহ্ন আর, কাশফুল ছাড়া,
তাই দেখে বাঙালিরা মেতে ওঠে দুর্গাপূজা, পূজা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায়।
বাংলার বুকে নেইকো কোন চিহ্ন আর বর্তমানে ঋতু হেমন্তের,
হেমন্ত আছে, হেমন্ত শুধু গান গায় স্টেজে আর ফাংশনে এই বাংলার বুকে বাংলায়।
শীতকালেতে  লাগেনাকো শীত,
লাগে নাকো পোহাইতে আগুন ও রৌদ্র।
আশেনাকো মুখে শীতের কোন গীত,
শীতের সময় রাতের বেলায় হয় না প্রয়োজন তোষক ও লেপের।
পাখা চালিয়ে সব দেখো ঘুমাচ্ছে কেমন ঠান্ডায় না কেঁপে,
আর বলব কি ভাই বসন্ত!
বসন্তের কথা আর বলার দরকার নাই,
কোকিলেরা সব হয়েছে প্রতিবন্ধী, কখন ডাকে তারা নিজেরাই জানেনা।
মনে হয় কোকিলেরা এটেছে ফন্দি,
মনে হয় তারা চোখে দেখিতে পায় না।
প্রাচীন কোকিলেরা ছিল বিজ্ঞ হ্যাঁ! হ্যাঁ!
এখন তারা হয়েছে অজ্ঞ।
তবে এতে মানুষের দোষ কিবা?
তারা চিনবে কেমনে  বসন্ত এলো কিনা।

# রাঙা খুকু

Umme Habiba **(IHCA)**

টুক টুকে রাঙা খুকু
কচি কচি দুটি হাত
আধো আধো কয়ে কয়ে
সারা বাড়ি করে মাত।

হাঁটি হাঁটি পায় পায়
বাধো বাধো চরনে,
টলি টলি চলি যায়
পুতলের গড়নে।

কাঁদো কাঁদো মুখ ভার
তবু কত শোভা পায়,
খিল খিল হাঁসি তার
সারা দেহে খেলে যায়।

মার বুকে কত সুখে
ফুল হয়ে ফুটেছে,
কত ঘর আলো করে
রাঙা খুকু রয়েছে।

## তওবা

সামরিন খাতুন

আল্লাহ তুমি মেহেরবান
পরম দয়াময়,
তোমার করুণায়
জীবন ধন্য হয়।
আল্লাহ তুমি দয়াবান
তুমি মমতাময়
তোমারে করুনা
সারা দুনিয়ায়।
করেছি যত ভুল, পাপ
সব করে দাও মাফ ।

## ফুল

**সওদা খাতুন** (আরবি **অনার্স**))

ফুলে আছে কত মধু
ফুলে আছে সৌরভ,
ফুলে আছে ভালোবাসা
ফুলে আছে গৌরব ।
ফুল হলো আল্লাহর
অনুপম সৃষ্টি,
ফুল তাই সবার
লাগে খুব মিষ্টি।

# ফুল ও ফল

suraiya khatun (IHCA)

আমাদের বাগানে তে,
ফোটে কত ফুল।
গোলাপ করবি চাঁপা
মালতী বকুল।
লাল লাল জবা আর
সাদা সাদা জুঁই।

আমাদের বাগানে তে
ফলে কত ফল,
আম জাম আনারশ
জিভে আসে জল।
পেঁপে কলা জামরুল
আছে নারিকেল,
ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা ও
পাকা পাকা বেল।

# আত্মকথা

মুসকান খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার (ইতিহাস অনার্স)

আসা যাওয়া এই পৃথিবীতে তুমি একলাই এসেছো।
স্বজন বান্ধব সকলকে নিয়ে সম্পর্কের রঙ মেখেছো।।

উন্নীত সময়ে কাছের মানুষ ছাড়বে তোমার সঙ্গ।
তবে মায়াজালে পড়লেই হবে সমস্ত কর্ম ভঙ্গ।।

বাঁচার তাগিদ্ সর্বদা যেন জীবনকে ধরে আঁকড়ে।
বিশুদ্ধতর মনের দেখা বুকের পাঁজরে।।

লুকায়িত না রেখে মুক্ত করো বেঁচে থাকার চাবিকাঠি।
শত্রু নিধনে তোমার দেখে অন্য জনে ধরবে লাঠি।।

নতুন সমাজে মুখের বুলি লুকায়ে রাখবে যে।
সমাজের দ্বারা শোষিত হয়ে লুটায়ে পড়বে সে।।

অসৎ হলে জীবনে পথ পাবে না খুঁজে।
পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিও সর্বদা চোখ বুজে।।

# স্বাধীনতার মানে

**নাসমিয়ারা খাতুন** (আরবি **অনার্স**))

সবাই বলে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা কি?
কেউকখনোআমরাকিতাভেবেদেখেছি?
পতাকাদিয়েফুলসাজিয়ে
সারারাত্রিগানবাজিয়ে
পাড়ারলোকেরঘুমভাঙিয়েব্যস্তহয়েছি।
স্বাধীনতারমানেবোঝাএখনবড়ইশক্ত
দেশবাসীরাকতইতাদেরঝরিয়েছিলরক্ত।
রক্তঋণেরদামটাভুলে
দিচ্ছিমোরাছাঁটটাচুলে
বাঁশেরমাথায় পতাকাতুলে
করছিদেশস্বাধীন।
দেশেরভালোদশেরভালোকরতেযারাপারে
তারাইপারেস্বাধীনতাদিতেসবাকারে।
আমরাখুশিরবার্তাদিয়ে
মিথ্যেতাদেরকাজটানিয়ে
অমান্যতাকরছিগিয়ে
খোদসমাজেরবুকে।
স্বাধীনতারমানে
এখনআমোদএবংফূর্তি
আগেরমতভারতমাতারনগ্ন হলমূর্তি,
পিক্‌নিক্‌আরবেড়াতেযাওয়া
ভালোমন্দরসকলেখাওয়া
গাএলিয়েমুখটাচাওয়া
এটাইস্বাধীনতা।
স্বাধীনতারআসলমানেজানতেযদিচাও
বীরগর্বেবুকফুলিয়েআজইশপথনাও
বীরেদেরইদেখানোপথে
হাতটাসবাইরেখেহাতে
চলবমোরা একইসাথে, একইপথে
এটাইহবেলক্ষ্য।

# ভ্রমন সাহিত্য

## সাগর মেলা

তানিয়া খাতুন (IHCA)

গঙ্গাসাগর মেলা যা হিন্দু জনমানষে গঙ্গাসাগর যাত্রা বা গঙ্গা স্নান নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেলাগুলোর মধ্যে গঙ্গাসাগর মেলা হলো অন্যতম। গঙ্গা স্নান করার জন্য বাংলার পাশাপাশি ভারতবর্ষের তথা সারা বিশ্বের হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা এই তীর্থস্থানে উপস্থিত হন।ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণে সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কপিল মুনির আশ্রমে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এই মেলা মূলত মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি যেমন একদিকে তীর্থভূমি আবার অন্যদিকে এটি মেলাভূমি। এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আবদ্ধ গঙ্গাসাগর মেলা।

মহাকবি কালিদাস কর্তৃক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত ভাষার কাব্য রঘুবংশম ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ব্রতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা বই থেকে তথ্য মেলে।মধ্যযুগের সময়ে দেশের প্রতিটি স্থান থেকে বিভিন্ন তীর্থযাত্রীরা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে গঙ্গা স্নান করতে আসতেন, যে কারণে জনমানুষে প্রচলিত আছে 'সব তীর্থ বারবার ' গঙ্গাসাগর একবার। বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত কপাললললকুণ্ডলা উপন্যাসে এই তীর্থ স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে যুগ যুগ ধরে গঙ্গাসাগর মেলা অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। যার প্রভাব আজও সমাজের লক্ষণীয় হিন্দু ধর্ম মতে জন্ম ও মৃত্যুর যে অনন্তচক্র তার থেকে মুক্তি হল মুখ্য বিষয়।তারা বিশ্বাস করেন মকর সংক্রান্তির মহলগ্নে গঙ্গাসাগরের পবিত্র জলে স্নান করলে মানুষের মুক্তি লাভ হয়। তাই পৌষ সংক্রান্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মানুষ পবিত্র গঙ্গা স্নানের জন্য গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হন। তীর্থযাত্রীদের স্নানের আচার অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতরা সাহায্য করেন। আবার পুন্যাথিরা ব্যক্তিগতভাবে স্নান ও আচার বিধি পালন করে থাকেন।

গঙ্গা নদীর ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও কম নয় ,।গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বড় বড় শহর , বন্দর গড়ে উঠেছে ও বিভিন্ন ধর্মীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে যাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ভাবাবেগ ফুটে ওঠে।

গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে কপিলমুনির আশ্রমে বিশাল মেলার আয়োজন হয়ে থাকে ,যেখানে হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়।যে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে তোলে। অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি দূষণের দিকটি ও লক্ষনীয়। তাই বলতে হয় ধর্ম তথা অর্থের পাশাপাশি পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

# হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ

তানিয়া খাতুন (তৃতীয় সেমিস্টার)

দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ভারতের অন্যতম শহর হায়দ্রাবাদ। চারশো বছরের পুরানো অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী। রাজ্যের পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নতমানের। এই জেলার বেশির ভাগই ঘন অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল। প্রাচীনকালে আত্রেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এখানে বাস করত , সম্ভবত তার থেকেই নাম হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। মৌর্য রাজাদের আমল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ আলাদা স্বীকৃতি পায়। বিজয়নগরের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা রাম রায়। টালিকোটার যুদ্ধে ১৫৬৫ সালে পরাজিত হয়ে তিরুপতির নিকট চন্দ্রগিরিতে আশ্রয় নেয়। এরপর ১৫৯১ সাল হতে কুতুবশাহী সুলতানদের শাসনে চলে। এরপর মোঘল সম্রাটেরা গোলকুন্ডা দখল করার পর অন্ধ্রপ্রদেশে মোঘলদের শাসন আরম্ভ হয়। ১৭২৪ সালে থেকে নিজামশাহী শাসন আরম্ভ হয়। ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নিজাম নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। স্বাধীনতার পরও নিজামদের শাসন চালু ছিল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী অন্ধ্রকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

তারপর ভাষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হলো তেলেগুভাষী রাজ্য। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ হয়ে ২০১৩ তেলেঙ্গনা রাজ্যের জন্ম হয়। দুই রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ রয়েছে। ঐতিহাসিক শহর হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ আর সেকেন্দ্রবাদকে একসাথে বলা হয় টুইন সিটি। ইতিহাসের সাথে সংশ্রিমণ ঘটেছে এখানে। সেকেন্দ্রবাদ , হায়দ্রাবাদ ও কাচিগুড়া তিনটি রেল

আধুনিক মহানগরী তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এই শহরকে পৌঁছে দিয়েছে সর্ব প্রথমে। হায়দ্রাবাদ শহরে দর্শনীয়-চারমিনার- চারশো বছরের পুরানো অনেক সুখ-

দুঃখের সাক্ষী, নির্মাণ, করেছিল মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ।রামোজী ফিল্ম সিটি , কাবা মসজিদ , নবাব প্যালেস, সালারজং-মিউজিয়াম- সারাপৃথিবীর মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন স্থাপত্যের এক ভাস্কর্য শৈলীর নানা নিদর্শন সংরক্ষিত হচ্ছে। অজন্তা প্যাভেলিয়ান- আর্কিওলজি ক্যাল মিউজিয়ামের পাশেই এই প্যাভেলিয়ান। শহর থেকে ১৪ কিমি. দূরে গোলকুণ্ডা দুর্গ। হিম্মত সাগর , হোসেনসাগর, ওসমান সাগর প্রভৃতি। হায়দ্রাবাদ শহর থেকে একটু দূরে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম শ্রী শৈলমে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন। এখানে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নাই। এখানে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য্য , শ্রীচেতন্যদেব। সতীদেবীর ৫১পীঠের এক পীঠ শ্রীশৈলম। শ্রীশৈলম থেকে ৮ কিমি. দূরে স্বন্নিপেন্টা। আছে ভারতের বৃহত্তম অভয়ারণ্য রাজীবগান্ধী ব্রাঘ্র প্রকল্প। বোটানিক্যাল গার্ডেন , নৌবত পাহাড়, লুম্বিনি পার্ক-হোসেন সাগর লেকের পাড়েই এই সুন্দর পার্কটি। এছাড়া দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তিরুপতি দর্শন করা যায়। দূরত্ব ৫৯২ কিমি.।

কি ভাবে যাবেন ? হাওড়া থেকে ট্রেন ইস্ট কোস্ট Ex, ফলক নামা Ex. এছাড়া আরো ট্রেন আছে। বিমান যোগাযোগ আছে।

## অনুগল্প

# পবিত্র আলো

**রাইসা রহমান**

হঠাৎ চোখে এসে পড়ে এক তীব্র আলোর ঝলক – সেই শুভারম্ভের শুরুর দিকে। তার পর থেকে বেড়েই চলেছে এই চোখ ধাঁধানো আলোর তীব্রতার গতিবিধি। এই রাতের অন্ধকারের আর এক নাম ছিল পবিত্র আলোর রাত। সমস্ত কালোর অন্ধকার দূরে সরিয়ে দেওয়ার তরে এই আলোর উৎসবের আয়োজন। আলোর অগণিত শব্দ ক্রমান্বয়ে গুঞ্জরিত। চারিদিকে শব্দবাজির মুহূর্মূহূ ধ্বনির ক্রমাগত আগমন। এক শব্দের ফিরে যাওয়ার আগেই অন্য কোনো অজানা শব্দের পুনঃআগমন।

রঞ্জনার হাতে ফুলঝুরি। ওইদিকে অঞ্জনা,লাকি, কবিতা, শুভ, রামি মিলেমিশে তুবড়িদের ক্রমবর্ধমান আলোর রশ্মির ভিন্ন রঙিন আনন্দে মেতেছে। আজকের রাত তাদের কাছে রামধনু রঙের বর্ষা নিয়ে হাজির অন্যান্য সব বছরের মতো...

কিছু দূরে একা দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির রবি। দিন ফুরিয়ে এখন যে রাত্রি গড়িয়ে যায়। তাই রবি কিরণও এখন অস্পষ্ট। তার স্পষ্টতার সময় কোনো আর এক দিনের সূচনা লগ্নে। এই কৃত্রিমতা তার মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না...

সে স্বপ্ন দেখে, কোনো দিন এই সমাজের মন সত্যি সত্যি আলোকিত হবে। সকল অশুভ অন্ধকার দূরীভূত হবে। সে তো আশাবাদী...

এই যে অসংখ্য আলোর রোশনাই। কত রঙিন মনস্কামনার ফানুস ওড়ে আশেপাশের এই লাল-নীল-সবুজ আকাশের প্রাঙ্গণে। এইসব পবিত্র রঙের আলো কী মনের অন্ধকার দূরীকরণের মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়; প্রতিটি ঈদ-দীপাবলি-শারদীয়া-দোল নামাঙ্কিত উৎসবের আবরণের মধ্যেই? এবার যেন তাই হয় – সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায়। ঘুচিয়ে সকল অন্ধত্ব ফুটুক আলো নব নব...

# শুভ যাত্রা

ফারহানা খাতুন **(বাংলা সাম্মানিক)**

টাইম টেবিলে ট্রেনের সময় কিন্তু লেখা ছিল বিকাল চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট। যদিও স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই আরশির চোখে পড়লো ঘড়ির কাঁটা প্রায় পাঁচটা ছুঁই ছুঁই। এমনিতেই আজ সে একটু সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে এসে সেই ছেড়ে-যাই-যাই ট্রেন ধরার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই।

তিরিশ মিনিট পূর্বে বাড়ি থেকে বেরিয়েই সম্মুখে চোখের সামনে একটা চলন্ত সোনালি টোটো। বিকালের পড়ন্ত রোদের মুখে পড়ে তার সোনালি রঙ ও চিকমিক করে ওঠে। দূর থেকে আরশি ডাক দিয়ে তাকে থামায়। সহযাত্রীদের মুখে-হাতে সর্বত্র ম্লান হয়ে আসা এই মিষ্টি আলো চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় একটি বার। এবার সে মুখ লুকিয়ে নিতে চায়।

এখানে ওখানে গুটি কয়েক মানুষের উপস্থিতি। ট্রেন আসতে এখনো কিছুটা সময় রয়ে গেছে। ভিড় বিশেষ নেই। তাই স্টেশনে এসে খালি বসার পর্যাপ্ত জায়গা দেখে বসতে যায় আরশি। ঠিক তখন লক্ষ করে পায়ের কাছে কিছু ছোটো ছোটো কয়েকটি অজানা গাছ। তারা বহু কষ্টে আগাছায় টিকে গেছে। তারা অবাঞ্ছিত। দেখেই বোঝা যায় তাদের পাতা-শাখা প্রশাখারা বিস্মৃত হয়ে গাঢ় সবুজের সে সুন্দরের আবেশ থেকে অনেক দূরে এসে অবস্থান করেছে ।

এখন তারা বহুদিনের অবহেলায় খয়েরী লাল প্রায় বর্ণ ধারণ করে আছে। সেখানে চলতি পথিকের মুখবিবর নিঃসৃত পানের পিচ্, কিছু তেরঙ্গার প্যাকেট, কয়েকটি ব্যবহৃত সিগারের ঘর – এইরূপে সব বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু যত্নে আশ্রয় পেয়েছে। তাদের নিরীহ কচি বুকের মাঝে এই সব অপ্রয়োজনীয় বস্তুর স্তূপের বোঝা এই ভাবে কত যুগ ধরে নির্বিচারে তারা বহন করে চলেছে, কয়জন ব্যস্ত মানুষ তার খবর রাখতে পারি?

হয়তো বেশ কয়েকদিনের আগামীতে এইভাবে কোনো এক আরশির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে তাদের বেদনার জানান দেওয়ার কোনো সম্ভাব্য সুযোগটুকুও আর আসবে না। বোঝাতে না পারার সম্ভাবনায় ডুব দেবে তারাও। এইভাবে হারিয়ে যায়, যাবে চিরতরে এই অসহায় প্রাণ।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় ট্রেনের জোরালো হর্নের শব্দে। আরশি এখন ট্রেনের থামার অপেক্ষায়। এবার তার 'শুভ যাত্রার' পালা।